বোধন

চিরঞ্জয় দাস

বিশাল বকুল গাছটার ডাল বেয়ে মন্দিরের আড়ালে সূর্যটা লুকিয়ে পড়তেই বোঝা গেলো সন্ধ্যাটা ঝপ করে নেমে পড়েছে। পৌষ মাস, পশ্চিমকাশে লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে। দিনের শেষে আলোর পথ দেখে পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে যাচ্ছে বাসায়। মিহি কুয়াশায় এর মধ্যে চারিদিক আচ্ছন্ন। দত্ত বাড়ির একটা খিড়কিও এখন খোলা নেই। এই বিশাল বাড়িটার পূর্বপু(ষ যে জমিদার ছিলেন তা বাড়িটা দেখলেই বোঝা যায়, সামনের বিশাল গেট পেরিয়ে সুরকিঢালা পথের দু'ধারে দেবদা(গাছের সারি, শিউলি, বকুল, গৈড় গাছের বাগান রেখে দত্ত বাড়িতে ঢুকতেই বাঁ দিকে তিনটে সুন্দর গাড়ি রাখা থাকে। বাড়ির ভিতরে বিশাল থামের সংলগ্ন দুর্গাদালানের এই অঞ্চলের সর্বপ্রাচীন দুর্গোৎসবের বয়স দেড়শো বছরের বেশী। উত্তর বঙ্গের এই গঞ্জটাতে প্রচুর গাছপালাকে সঙ্গি করে মানুষজন বেঁচে আছে বলে দূষণ আর গঞ্জটা নিয়ে শহর এখনো থাবা বসাতে পারে নি। ছিমছাম জীবনযাত্রা আর সরল মনের মানুষগুলোকে নিয়ে এই অঞ্চলটা মিলেমিশে বেশ আছে।

হেমলতা সন্ধে দিয়ে একতলায় নেমে এলেন। তিনি এই বাড়ির কর্ত্রী। ধবধবে রঙ, মাঝারি উচ্চতায় আর দুর্গাঠাকুরের মতো টানাটানা দুচোখে চল্লিশোর্ধ এই রমনীকে বয়স ভারি করে তুলতে পারে নি। দেওয়ার মধ্যে বয়স তাকে দিয়েছে এক অনমনীয় ব্যক্তি(ত্ব। এই সংসারের অদৃশ্য চাবি কাঠি তাঁর হাতে যা দিয়ে গত পঁচিশ বছর ধরে তিনি এই সংসার পরিচালনা করে চলেছেন।

একতলার বিশাল বসার ঘরটাতে ঢুকতেই রামমোহন উঠে দাঁড়ালেন। হেমলতাদের জমিদারির দেওয়ান হলেন রামমোহন। লম্বা চেহারা, কাঁচাপকা চুল, সমত্ন বর্ধিত হ(ষ্টু গোঁফে - রামমোহনের গায়ে আটা একটা মোটা চাদর, মিতভাষী ভদ্রলোকটি সাত চল্লিশ বছর ধরে এই বাড়ির শুধু দেওয়ানই নয় একজন শুভাকাঙ্খী এবং ভালো বন্ধুও।

হেমলতা বললেন - বসুন দেওয়ানজী।

দুজনেই বসলেন, বিশাল এই বসার ঘরটাতে সব আসবাবই বৃটিশ আমলের। এখন পুরোপুরি অন্ধকার নেমেছে, এই অঞ্চলে এবার শীত ঠান্ডা পড়েছে খুব।

হেমলতা বললেন - গোঁসাই গঞ্জে এই বাড়ির দলিলটা কি পেয়েছেন?

- হ্যাঁ রানীমা। রামমোহন দলিল টা এগিয়ে দিলেন।

- টাকা দেওয়া হয়েছে তো?

- হ্যাঁ রানীমা।

হোমলতা দলিলটা নেড়েচেড়ে দেখলেন। তাঁর মুখে একটা তুপ্তির হাসি ফুটে উঠলো।

- স্কুলটার কাজ চলছে তো?

- হ্যাঁ রানিমা, তা প্রায় শেষের দিকে, ওঙ্কারনাথ বাবুকে চিঠি পাঠিয়েছি

- আর ঐ মেয়েগুলোর খবর কি?

- ওদের আপাতত আশ্রমে রাখা হয়েছে, ওরা ভালোই আছে।

- দেখবেন যেন কোন অসুবিধা না হয়। আমি কাল একবার যাব

- আজ্ঞে।

- ঐ ছেলে গুলোকে পাওয়া গেল?

- আজ্ঞে না।

- কোনো খবর?

- পুলিশ খুঁজছে।

- ইন্সপেকটর মনি নাথকে একবার দেখা করতে বলবেন আমার সঙ্গে।

- ঠিক আছে।

- আচ্ছা।

উঠে দাঁড়ালেন হেমলতা, হাতে দলিলটা নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন, ঘরে ঘরে এখন শাঁখের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কাছেই স্টেশন গোঁসাইগঞ্জে যাওয়ার শেষ ট্রেনটা ছেড়ে গেলো বোধহয়। এই শীতে আর কুয়াশায় রাস্তার ঝাপসা আলোগুলো যেন কাঁপছে। বাইরে মানুষজনের কোনো চিহ্(মাত্র নেই। শুধু অদূরের মন্দিরে পুরোহিত কালিকারঞ্জনকে দেখা গেলো। এই প্রচণ্ড শীতেও বৃদ্ধের পরনে শুধুই একটা নামাবলী। লোহার দরজাটা বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো। দেওয়ানজী চলে গেলেন বোধহয়।

হেমলতা দোতালায় উঠে এলেন, নিজের ঘরে এসে সিন্দুকে দলিলটি রাখলেন, কন্দর্পনারায়ন বিশাল পালঙ্কে শুয়ে বই পড়ছিলেন। হেমলতার স্বামী, তবে জমিদারী সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। পণ্ডিত মানুষ। এবং একজন সমাজ সেবক। এই সমগ্র অঙ্গনটাই তাঁদের জমিদারী, কি করেননি তিনি এই মানুষগুলোর জন্য, চিকিৎসালয়, স্কুলে - কলেজ, আশ্রম, পাঠাগার, দুঃস্থদের সাহায্য, যখনই তাঁর কাছে কোনো সাহায্য চাওয়া হয় তিনি সর্বদা মানুষের পাশে দাঁড়ান।

এই সুবিশাল জমিদারির সব ভারই হেমলতার ওপর। ষোল বছর বয়সে তিনি দত্তবাড়িতে বউ হয়ে এসেছিলেন। সমাজসেবিকা তিনি নিজেও। মহিলা সমিতি, আশ্রম, হরিসভা এ সবই তিনি নিজে প্রতিষ্ঠা করেছেন, এই হরিপুরে তাঁকে সকলে রানীমা বলে ডাকেন। একবার স্বামীর দিকে তাকালেন হেমলতা, টেবিলের ওষুধগুলো খেতে কন্দর্পনারায়ন নিশ্চয় ভুলেগেছেন, তিনি ওষুধ আর জল এগিয়ে ধরলেন।

- আবার ওষুধ কেন। জ্বর তো নেই এখন।

- না থাক। ডাক্ত(ার তিনদিন খেতে বলেছেন।

বাধ্য ছেলের মতো ওষুধটুকু খেয়ে নিলেন কন্দর্পনারায়ন।

- এখন কিছু খাবে?

- মিষ্টি - করে আর এক কাপ চা আনো না।

- মিষ্টি একেবারে নয়। ডাক্ত(ারের বারণ।

- হেম ডাক্ত(ার তো জল বাদ দিয়ে সব কিছুই খেতে বারন করেছে দেখছি।

- না, কটা দিন সাবধানে থাকো। কোনো নিয়মই তো মানোনি কোনদিন।

রতিকান্ত দত্ত বাড়ির ডাক্ত(ার। কন্দর্পনারায়নের রক্তে(শর্করা ধরা পড়ায় ওনার অনেককিছু খাওয়াই বারণ। তাছাড়া কদিন জ্বরও হয়েছে তার। হেমলতার কঠোর তত্ত্বাবধানে রয়েছেন তিনি। সমাজের নানা ধরনের কাজ, কোন গ্রামের কার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, কোথায় চিকিৎসালয় নেই, কোথায় স্কুল নেই, এই করে বেড়াতে বেড়াতে খাওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত অনিয়মের শিকার হয়েছেন কন্দর্পনারায়ন প্রায় সারাজীবন। শরীরে আভ্যন্তরীন যন্ত্রপাতিগুলো এই অপমান অবহেলা সহ্য করে করে আজ সকলেই প্রায় একসাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। হেমলতা পরিবারের সকলকেই কঠিন নিয়মানুবর্তীতায় বাঁধলেও এই মানুষটিকে পারেননি। আজ ষাটোর্ধ কন্দর্পনারায়নকে শরীর বেশ কিছুটা কাবু করেছে। হেমলতা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আজ শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছিল। সারাদিন উত্তরে হাওয়ার তাণ্ডব একরাশ কন্‌কনে ঠান্ডা জুটিয়েছে কোথা থেকে। হেমলতা রান্নার ঠাকুরকে রাতের রান্নার নির্দেশ দিয়ে কন্দর্পনারায়নের জন্য মিষ্টিছাড়া চা পাঠিয়ে দিতে - নির্দেশ দিলেন, অনতিদূরে হরিসভায় কীর্তনের সুর ভেসে আসছে, বাড়ির পরিচারিকাদের সাথে কিছু - সংসারিক নির্দেশ দিয়ে তিনি ঠাকুরঘরে ঢুকলেন, প্রতিদিন সন্ধের এই সময়টা ঘন্টাখানেক তাঁর বালগোপালের তত্ত্বাবধানে ব্যয় হয়।

বালগোপাল দত্তপরিবারের কুলদেবতা। প্রায় দেড়-শ বছর আগে কন্দর্পনারায়নের প্রপিতামহ দেবেন্দ্রনারায়ন বালগোপালের প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে এক প্রবল বর্ষনের রাতে ঘুমে নাকি উনি আদেশ পান কষ্টিপাথরের গোপাল সামনের পূর্ণিমায় প্রতিষ্ঠা করার। পরদিনই দেবেন্দ্রনারায়ণ এই বালগোপালকে প্রতিষ্ঠা করেন। দেবতার আদেশ, সেই সময় দেবেন্দ্রনারায়ণ এই বালগোপালকে প্রতিষ্ঠা করেন। দেবতার আদেশ, সেই সময় জমিদারি খাজনা নিয়ে তৎকালিন কালেকটর সাহেব রবার্ট কিং -এর সাথে দেবেন্দ্রনারায়নের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। তখন ইংরেজই দেশের বিধাতা। জমিদার তাদের হাতের পুতুলমাত্র। ঘোর চিন্তিত এবং পর্যুদস্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ কোনোকালেই ধার্মিক ছিলেন না। তবে গোপাল প্রতিষ্ঠার পর দু'দিনের মাথায় ইংরেজ সাহেব রবার্ট কিং-এর দেশে ফেরার আদেশ আসে এবং তিনি ফিরেও যান। জমিদারি সংক্র(ান্ত আর কোনো সমস্যা থাকে না দেবেন্দ্র নারায়নের, তখন হরিহর আলাদা করে কিছু ছিলো না, পাঁচ ছটা গ্রাম মিলে ছিল (ক্কিনিনগর, সেই থেকে বালগোপালই এই বাড়ির গৃহদেবতা।

গত বছর শীতে কন্দর্পনারায়ন গোঁসাইগঞ্জে এক বন্ধুর মেয়ের বিবাহে আমন্ত্রিত হয়ে যান, হেমলতার শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি নিজেকে যেতে না পারায় পুত্র কৃষ(নারায়নকে পাঠিয়ে দেন। গোঁসাইগঞ্জে কন্দর্পনারায়নের বাল্য বন্ধু ব্রজকিশোর চৌধুরীর বাস। ব্রজকিশোর এক সাথে কন্দর্পনারায়নের সাথে পড়েছেন। একসময় ব্রজরা ধনী ছিলেন। তবে ভাগ্যের দুর্বোধ্য পরিহাসে আজ তারা প্রায় সহায় সম্বলহীন, ব্রজদের ছিলো পারিবারিক ব্যবসা। তিন ভাইয়ের মধ্যে ছোট সে, ব্রজ চিরকালই বই পত্র নিয়ে থাকতে পছন্দ করে। ব্যবসা তার মাথায় নেই, তার বাবার মৃত্যুর পর একদিন সে আবিষ্কার করে তার দুই দাদা সবকিছু নিজেদের নামে লিখে নিয়েছে। নিজে কিছু না পাওয়ার চেয়েও সে দুই দাদার ব্যবহারে এতটাই আহত হয় সে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখার প্রবৃত্তি তার হয় নি। একমাত্র মেয়ে চান্দ্রেয়ীর বিবাহ দিতে হয় বাড়ি বন্দক রেখে। একথা ব্রজ ছাড়া কেউ জানেন না। ব্রজ নিজে গোঁসাইগঞ্জে থেকে কিছুদূরে এক স্থানে খাতা লেখার বা হিসেব রাখার কাজ করেন। সেই উর্পাজনে সংসার কি চলে?

বিয়ে বাড়ির ধুমধামের নিষ্প্রভ আয়োজনেই ব্রজকিশোরের সংগতির কথা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ব্রজকিশোরের এক বিধবা বোনের দুই কন্যাও এই বাড়িতে থাকে। মাধবীলতার স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁকে চূড়ান্ত অপমান করে শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করা হয়, ছোট মেয়ে দুটোরও প্রতি কোনো মমতা প্রদর্শন করা হয় না। মাধবীলতা আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করলে এক পুরোহিত তাঁকে বাঁচিয়ে ব্রজকিশোরের পিতার কাছে তাঁকে দিয়ে যান, দাদারা এই ভাবে তাদের বঞ্চিত করেছিলো তখন ব্রজকিশোর হাসতে হাসতে এই অসহায় নারীটিকে নিজের সংসারে টেনে নেন।

বিয়ে বাড়িতে যখন সানাইয়ের মেদুর সুর এই দুঃখী সংসারের কাহিনীই যেন রাষ্ট্র করছিলো তখন সন্ধ্যা নেমে গেছে। বর এসে পড়ায় তখন একটা হুলুস্থুল পড়ে গেছে। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনিতে যখন বাতাস কাঁপছে কন্দর্পনারায়ন ও কৃষ(নারায়ণ তখন এসে পৌঁছেছেন, ব্রজকিশোরের সাথে বাক্যালাপে তিনি জেনেছেন পাত্রের কথা। সুপাত্র। আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল, বয়স কিঞ্চিৎ বেশী হলেও চান্দ্রেয়ীর ভাগ্যে এত ভালো স্বামী থাকবে এ যেন কেউ চিন্তা করতে পারেনি। পাত্র নিজে চান্দ্রেয়ীকে পছন্দ করেছে। তার কোনো দাবিদাওয়াও নেই। ব্রজকিশোরের মেয়েটি সুখি হবে ভেবে কন্দর্পনারায়নের ভালো লাগলো। তবো ছাদনা তলায় বর দেখে কন্দর্পনারায়ন চমকে উঠলেন, এই ----- সুপাত্রটি যে তাঁর বেশ চেনা। বর্তমানে হরিপুরের সংলগ্ন গঞ্জে শহুরে বাতাস ঢুকে যাচ্ছে। প্রামোটাররা সেখানে নতুন বাড়ি তুলে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে যাচ্ছে, হরিপুরের মধ্যেও যে তারা আসে নি তা নয়, এবং সবচেয়ে বেশীবার এসেছে পরেশনাথ। সে যে লোককে লোভ দেখিয়ে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে একথা কন্দর্পনারায়নের কানে তোলে হরিপুর বাসীরা। কন্দর্পনারায়নের সাথে জমিদার বাড়ির প্রজারা চড়াও হতেই পরেশনাথ সেই যে পালায় আর তার খোঁজ পাওয়া যায় না। এই পরেশনাথের বেশ কিছু কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত। সেই সব কাহিনী মোটেই পরেশনাথকে চরিত্রবান করে তোলে না। এই পরেশনাথই যে ব্রজকিশোরের সুপাত্র - তা কে জানতো। লগ্ন প্রায় উপস্থিত। বিয়েবাড়িতে মাঝে নাঝেই হাসির রোল উঠছে। উৎসবের বাড়িতে সকলেই ব্যস্ত। কন্দর্পনারায়ন ব্রজকিশোরকে নিভৃতে এনে সব কথা বললেন। শেষে বললেন,

- এ কার হাতে মেয়েকে তুলে দিচ্ছ ব্রজ?

ব্রজকিশোর কথা বলতে পারলেন না। তাঁর চোখে জল।

- একবার আমাকেও জানালে না ব্রজ।

- কি করব ভাই। আমার অবস্থা তো জানো। মেয়েটার এত - ভালো সম্বন্ধটা পেয়ে আর কিছু ভাবিনি। এখন কি করি। বলে কন্দর্পনারায়ন চলে এলেন ছাদনা তলায়।

ব্রজকিশোর স্তম্ভিত হয়ে বসেছিলেন, চোখ ঝাপসা। একি করেছেন তিনি। কত(ন এইবাবে ছিলেন খেয়াল নেই। সম্বিৎ ফিরতে তিনি দেখলেন বিয়েবাড়ি আশ্চর্যরকম নিস্তব্ধ। ছাদনাতলায় এসে দেখলেন বরপ(র কোনো চিহ্(ই নেই।

- বরযাত্রীরা কোথায়? ব্রজকিশোর জিজ্ঞাসা করলেন।

- সববাইকে তাড়িয়ে দিয়েছি আমি। কন্দপনারায়ন এগিয়ে এলেন।

- এখন কি হবে? মাথায় হাত দিয়ে ব্রজকিশোর বসে পড়লেন। লগ্ন প্রায় আসন্ন, গরিবের মেয়ে। একবার বিয়ে ভাঙলে আর র(া আচে, তাছাড়া বাড়ি বন্ধকের টাকায় সব আয়োজন আর টাকাই বা কোথায়?

- ব্রজকিশোর। কন্দর্পনারায়ন ডেকে উঠলেন। এই ডাকে কিসের যেন একটা ইঙ্গিত।

- আমি যদি চান্দ্রেয়ীমাকে নিজের ঘরে নিয়ে যাই।

- কি বলছ তুমি। ব্রজকিশোর কেঁদে ফেললেন। একি শুনছেন তিনি? কৃষ(নারায়ন স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তবে বাবার কথায় প্রতিবাদ করা তার স্বভাববি(দ্ধ। চান্দ্রেয়ীর সাথে কৃষ(নারায়নের শুভবিবাহ সম্পন্ন হলো। কন্দর্পনারায়ন বুঝতে পারলেন তিনি উপযুক্ত(গৃহল(ী পেয়েছেন।

দত্তবাড়ির বিশাল ফটক পেরিয়ে মল্লিকদের দোতলা বাড়ি। এই বাড়ির বয়সত্ত একশোর ওপাশে। হরিপুরের মিউনিসিপালিটি ডাক্ত(ারখানার উল্টোদিকেই। এই ডাক্ত(ারখানায় ভিড় লেগেই থাকে। প্রাননাথ মল্লিকের বয়স কন্দর্পনারায়ন চেয়ে কিছু বেশী। প্রাননাথের স্ত্রী রাধা হেমলতার সহৃদয় বান্ধবী। হেমলতার চরম দুঃ

সময়ে এই - সংসারটা তাঁকে দু হাতে সাহায্য করেছিল, এক মেয়ে ইন্দ্রানী রূপে গুনে ইন্দ্রানীই বটে। সে এই বারই স্নাতকস্তরে পরী(ায় উত্তীর্ন হয়েছে। এই দুই পরিবারের মধ্যে প্রায় রক্তে(র সম্পর্ক। প্রাননাথের চরমতম সড়কদুর্ঘটনার পর থেকে যখন কোনো আত্মীয়স্বজন সাহায্য করতে এগিয়ে এলো না তখন ইন্দ্রানী মাধ্যমিক দিয়েছে সবে। চাকরীটাও রইল না, যা সব ছিলো তা প্রাননাথের জন্যই জলের মতো ব্যয় হয়ে গেল। সেই চরম কঠিন সময়ে এই ভেঙে পড়া সংসারটার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন হেমলতা। ইন্দ্রানীর সব দায়িত্ব, প্রাননাথের চিকিৎসার ভার - এক কথায় সব দায়িত্বই হেমলতা নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। এককালে সচ্ছল প্রাননাথ হেমলতার সাহায্য নিতে যখন অগ্রাহ্য করেছেন তখন হেমলতা বলেছেন যে ইন্দ্রানীকে নিজের পুত্রবধু করতে চান তিনি তাই সব দায়িত্বই তাঁর নিজের। প্রাননাথের কোনো বাধা আর টেকেনি। কন্দর্পনারায়নও এই প্রস্তাবে সোৎসাহে সায় দেন। সুতরাং এই দুই পরিবারের সম্পর্ক প্রতিবেশী থেকে আত্মীয়তায় রূপান্তরিত হয়েছে, কৃষ(নারায়ন ইন্দ্রানীর বিবাহ - শুধু ছিল সময়ের অপে(া, কৃষ(নারায়ন মুখচেরা, ইন্দ্রানীর সঙ্গে তার খুব কমই কথা হয়েছে বিশেষতঃ তাদের বিয়ের কথার পর।

এইরকম সময়ে পৌষমাসের এক সকালে জমিদারবাড়ির এক ভৃত্য এসে খবর দেয় কৃষ(নারায় ও চান্দ্রেয়ীর বিবাহের। এক অসময়ের কোকিল রৌদ্রঢালা মিষ্টি সকালে তখন একনাগাড়ে ডেকে চলেছে। হেমলতা যখন এই কথার অর্থ উদ্ধারের দোলাচলে তখনই কৃষ(নারায়ন স্ত্রী নিয়ে বাড়িতে এসে পড়েছে। কোনো আয়োজনের ত্রুটি না রেখে সঠিক আচারে তিনি পুত্র ও পুত্রবধূকে ঘরে তোলেন। চান্দ্রেয়ীর মিষ্টি মুখ তাঁর মুখে হাসি ফোটালেও ভিতরে তিনি কঠিন হয়েছিলেন। কন্দর্পনারায়নের সব কথা শুনেও তিনি এই বিবাহটাকে মন থেকে সমর্থন করতে পারেননি। ইন্দ্রানীর মুখটা মনে পড়ে গেছে বারংবার।

এরপর প্রচুর আয়োজনে বৌভাত হয়েছে। কন্দর্পনারায়ন নিজে প্রাননাথ দের নিমন্ত্রন করে এসেছেন। কিন্তু তারা আসেননি, এর কয়েকদিন পর প্রাননাথের মৃত্যু হয়। হেমলতা মানসিক ভাবে ভেবে নেন সে এই মৃত্যুর জন্য তাঁরাই দায়ী। এরপর থেকে চান্দ্রেয়ী বা কৃষ(নারায়নের সাথে হেমলতার বাক্যবিনিময় প্রায় হয়ইনি। পুত্রবধূও হেমলতার সাথে মিশতে সাহস পায় নি। এক অদৃশ্য প্রাচীর গড়ে উঠেছে দুজনের মধ্যে।

হেমলতা গতরাতে দেওয়ানজীকে বলে রেখেছিলেন যে তিনি নির্মীয়মান আশ্রমটায় একবার যাবেন। এই আশ্রম হেমলতাই প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কিছু কাজ এখনো চলছে। আশ্রমে গোপালের একটা শ্বেতপাথরের মূর্তি আছে, এই আশ্রমে দুঃস্থ ভাগ্যহীনা মেয়েদের, বৃদ্ধ - বৃদ্ধাদের বা পিতৃমাতৃহীন শিশুদের স্থান দেওয়া হয়। এখানে কিছু কিছু হাতের কাজ করে মেয়েরা বিক্রী করে যা থেকে তাদের উপার্জন হয়। বাকি সব খরচ জমিদার বাড়ির।

হেমলতা সকাল দশটার সময় আশ্রমে পৌঁছলেন। সঙ্গে দেওয়ানজী শ্বেতপাথরের চাতালে পৌষের ভরাট রোদ উপচে পড়ছে। কিন্তু চড়ুই খেলে বেড়াচ্ছে। চাতালটা বরফের মতো ঠাণ্ডা। একটা মালগাড়ি কাছেই স্টেশনে ঢুকছে। নলেনগুড়ের সন্দেশ হাঁকছে ফেরিওয়ালা। আশ্রমে ঢুকতেই পুরোহিত রাজমোহন এগিয়ে এলেন। কিছু কুশল বিনিময় করে এগিয়ে গেলেন হেমলতা।

- মেয়েগুলো কোন ঘরে দেওয়ানজী?

- ওদের কোনের কয়েকজন মেয়ে মুছছে। কেউ গোপালের পুজোর আয়োজন করছে। সকলেই স্নান সেরে নিয়েছে, ওরা সকলেই হেমলতার কুশল জিজ্ঞাসা করছে। প্রণাম করছে। হেমলতা পা ছুঁতে দিচ্ছে না। মেয়েদের সকলেরই নাম তাঁর জানা। বৃদ্ধাবাস ও শিশুদের থাকার স্থান আশ্রমের অন্য প্রান্তে।

আশ্রমের মাঝ বরাবর রোদ পড়েছে বটে তবে আশপাশে শীতল ছায়ায় এই পৌষমাসে যেন হিম ঘাপটি মেরে আছে। আশ্রমের মাঝখানটা খোলা। সামনেই গোপালের মূর্তি। এই স্থানটায় উপাসনা হয়। চারধারে উঁচু দালানে ঘরগুলোর বেশীরভাগই তালাবন্ধ। হেমলতা দালান বরাবর এসে একটা খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটা প্রকাণ্ড উঠোনে পড়লেন। খোলা উঠনে পৌষের রোদ ছায়ার সাথে খেলা করছে। চারপাশে আরো ঘর রয়েছে এখানে। একধারে একটা সুবিশাল বটগাছ প্রাচীন এক দার্শনিকের মতো দাঁড়িয়ে আশ্রম পেরিয়ে দিঘীর দিকে উকি মারছে। কাছেই রান্নাঘরে আশ্রমবাসীদের জন্য রান্না চাপানো হয়েছে।

দেওয়ানজী একটি ছোট ছেলের সাথে কিছু কথা বললেন। উঠোনে কিছু কিছু লোকের উপস্থিতি। কেউ রান্নার ঠাকুর। কেউ আশ্রমবাসী। সকলেই হেমলতাকে সম্মান জ্ঞাপন করছেন। কিছু দূরে চাতালে কটি মেয়ে বসে ছিলো। এদের দেখে বোঝা যায় এরা ভয়ার্ত। হেমলতা ওদের কাছে আসতেই ওরা উঠে দাঁড়ালো। দেওয়ানজী হেমলতার পরিচয় দিলে এরা করজোড়ে প্রণাম করলো, পাঁচজন মেয়ের বয়স কারোরই আঠারোর ওপারে নয়।

দিন তিনের আগে দত্তবাড়ির সোনার দোকানের পাহারাদার রামসিং রাতের দিকে স্টেশনমাস্টার দুবেজীর সাথে সা(াত করতে গেছিলো। আসলে রাত নটার পর দু'বেজীর ওখানে তাসের আড্ডা বসে। দুবেজীর, ডাউনের একটা মালগাড়ি চলে গেলে নটা নাগাদ ফিরবেন তাঁর ঘরে। স্টেশনের লাগোয়া একচালার ঘরে ঠাকুর দেবতার ছবি ভর্তি, দুবেজী ব্রাহ্মন অবিবাহিত। হরিপুরের হেডমাস্টার বিভূতি আর হাইস্কুলের মাস্টার শঙ্কর প্রসাদ তখনো আসেননি, ছোট প্-াটফর্মে খুব কম আলোর ব্যবস্থা রয়েছে। তার ওপর কুয়াসায় চারদিক ঢাকা, দু পাত্তর চড়িয়ে এলেও রামসিংয়ের নেশা হয় নি। একটা ল্যাম্পপোষ্টে আলো না জ্বালায় তার চারিদিকে জমাট অন্ধকার। তার আসেপাশে কিছু ছায়ামূর্তি দেখে সন্দিগ্ধ হয়ে রামসিং এগিয়ে দেখে দুটি ছেলে পাঁচটি মেয়ে নিয়ে নিচু স্বরে কিছু বলছে। তৎ(নাৎ রামসিং বাবলু আর বাপ্পাকে চিনতে পারে আর তেড়ে আসে। এরা যে মেয়েগুলোকে পাচার করার জন্য এসেছে তা বুঝতে রামসিংয়ের সময় লাগে না। এদিকে বেখেয়ালে রামসিং কে দেখে বাবলুরা প্রানভয়ে পালায়। সেদিন রামসিং না এলে এই মেয়েগুলো চিরতরে হারিয়ে যেতো।

প্রীতি, দেবী, লতা, রাধিকা আর গোপা - এদের সকলকে জিজ্ঞাস করে জানা গেছে বাবলুরা আশপাশের গ্রাম গঞ্জথেকে কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জোগাড় করেছিলো, এরা সকলেই গরিব, তবে এদের ভবিষ্যতে কি লেখা ছিলো ভাবতেই এরা ফুঁপিয়ে উঠছে। হেমলতাকে দেখে ও এদের ভয়ার্ত ভাবটা কাটেনি। সকলের পরিচয় নিয়ে জানতে পারলেন রাধিকা গোঁসাইগঞ্জের মেয়ে। রাধিকাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন হেমলতা। পরনের আধময়লা সাড়ি রাধিকার দারিদ্র্য প্রকট করে তুলছে। মেয়েদের সবচেয়ে বড় সম্মান যে তার পবিত্রতা এ তিনি জানেন। রাধিকার বাড়ির সব খবর নিভৃতে নিয়ে তিনি অনুভব করলেন তাঁর চোখ আর্দ্র হয়ে উঠেছে।

ষোল বছর বয়সে দত্ত বাড়িতে প্রথম এসেছিলেন হেমলতা। পিতৃমাতৃহীন এই ত(ণীটিকে তার স্বার্থপর কাকা আশ্রয় দিয়েছিলেন বটে তবে মর্যাদা বাড়িয়ে মেয়ের মতো নয়, সংসারের যাবতীয় কাজ করার দায় ছিলো এই ত(ণীটির ওপর। পড়াশুনো কবেই শেষ হয়েগেছে। আহার নিদ্রাহীন দুঃখদুর্দশাজর্জরিত হেমলতার আশ্রয়ই ছিলো একমাত্র সম্বল। গ্রামের পুরোহিত কুমুদরঞ্জন একদিন ভোরে এই দুঃখী মেয়েটিকে দত্তবাড়িতে নিয়ে আসেন। হেমলতার যৌবন তখন দুচোখ মেলে রয়েছে। চারিদিকে শিকারীর পাল তখন ওঁত পেতে। এমন সময় আশ্বিনমাসের এক সকালে ভয়মাখা বড় বড় দুটো চোখে দত্তবাড়িতে এসে ঢুকলেন, তখন দুর্গাদালানে মোহিত ঠাকুর দুর্গাপ্রতিমাতে রঙ করছেন। বীরেন্দ্রনারায়ন হেমলতার সকল কথা শুনে ওঁকে আশ্রয় দিলেন। কুমুদরঞ্জন প্রত্যেক বার এই সময় দত্ত বাড়িতে আসেন মা দুর্গার পুজো করতে। এইবার তিনি কিছু আগেই এসেছেন হিমের জন্য, সেদিন রাতে বীরেন্দ্রনারায়নের গা ভরে জ্বর আসে। সাতদিনের মধ্যে জ্বর নিরাময় না হওয়ায় যখন ডাক্ত(ারেরা নাজেহাল ঠিক তখন তিন দিনের শুশ্রূষায় হেমলতার একার হাতে বীরেন্দ্রনারায়ন সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই অসাধারন (পসী মেয়েটাকে দেখেই সেই চিন্তার উদয় হয়েছিলো তা সানন্দে তিনি রূপায়িত করেন। পুত্রের সাথে হেমলতার বিবাহ দেন। বিবাহের পর হেমলতার আরেক যুদ্ধ শু(হয়। কন্দর্পনারায়নের এক বিধবা পিসী এই বাড়িতেই থাকতেন। গোপনস্বভাবের মহিলাটি নিজের গায়ের জোরে এই বাড়ির সম্রাজ্ঞী কল্পনা করতেন। ব্যবসাপত্র, জমিদারী একাংশ তিনি নিজের দখলে রেখেছিলেন জোর করে। ব্যবসাপত্রে প্রায় গোল দেখা দিত। হিসাব মিলত না। দোষ বর্তাত নীচের কর্মচারীদের প্রতি। সেই সময় হেমলতার মাসখানেক হলো বিয়ে হয়েছে, পাশের মল্লিক বাড়ির রাধা প্রায় দুপুরেই এই বাড়িতে হেমের সাথে গল্প করতে আসতো। এই রকম এক দুপুরে হেমলতা পিসীর কিছু কথা শুনে ফেলেন কাছারীঘর থেকে টাকা সরিয়ে একচাকরের হাতে অমুক বাবুর হাতে দিতে নির্দেশ দিচ্ছেন হঠাৎ করে যে হেমলতা এসে পড়বেন পিসীর আন্দাজ ছিলো না। এখন তিনি

দ্রুত অন্যত্র চলে যান। চাকরটিও, পিসীর কুকর্ম টের পেলেও হেমলতা কিছু কাউকে বলেন না। পিসী একেই দু'দিন দত্তবাড়ির চোখের মনি হয়ে ওঠা এই মেয়েটিকে সহ্য করতে পারতেন না, তাঁর বিদ্বেষের সাথে এবং ধরা পড়ার ভয় মেনে। দিনকয়েক বাদে পিসীর বিশভরি সোনার হার চুরি হওয়ার দোষ হেমের ওপর পড়ে এবং খুঁজে সেই হার হেমের বিছানার তলা থেকে বের হয়। দোষের ভাগী হয়ে হেম যখন কেঁদে ভাসাচ্ছে রাধা বীরেন্দ্রনারায়নের কাছে এসে পিসীর টাকা সরানোর কথাটা জানান। বীরেন্দ্র হেমলতাকে কখনো সন্দেহ করেন নি তবে ছোট বোনের কীর্তি শুনে তিনি নড়েচড়ে বসেন। হিসাব না মেলার কথা তাঁর কানেও এসেছে। চাকরটিকে ডেকে সব জিজ্ঞাসাবাদ করাতে চাকরটি সত্যি বলে ফেলে। আসলে হেম সকলকেই খুব স্নেহ করতেন। এই চাকরটি নিজে থেকে দেবীটির কাছে সকল দোষ স্বীকার করে। জানা যায় পিসীর আদেশেই সেই হার সে হেমের ঘরে রেখে আসে তাঁকে চোর বদনাম দেওয়ার দায়ে। জানা যায় পিসীর সাথে হেডমাস্টার ব্রজেন বাবুর অবৈধ সম্পর্কের কথা এবং টাকা সরিয়ে ব্রজেন বাবুকে দেওয়ার কথা। সেইদিনই ছোটবোনকে চিরকালের জন্য বারানসীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

চান্দ্রেয়ী কৃষ(নারায়নকে দেখে মাঝেমাঝে ভাবে তার জন্যে এত সুন্দর একটা স্বামী ছিলো, রাতের পর রাত ত(ণ স্বামীটির শরীরে মিশে যেতে যেতে তার মনে হয় এ বুঝি শুধুই স্বপ্ন। তার (শ্বশুরমশাইটি বেশ হাসিখুশী আপনভোলা মানুষ। প্রত্যেক সকালে তাদের দ(ন দিকের ঘরে একবার এসে পুত্রবধুর সাথে কিছুটা গল্প করা তাঁর চাই-ই। সেই এই বাড়িতে আমার প্রথম দিন থেকে চলছে। সেও (শ্বশুরের সাথে বেশ সাবলীল। তবে হেমলতা এ পর্যন্ত মাড়ান নি কোনোদিন। সেই যে বিয়ের পর দিন চান্দ্রেয়ীকে এই ঘরে এনে তুলেছিলেন এরপর আর এই ঘরে তিনি আসেন নি। দোতলায় দুই প্রান্তে দু'জনের বাস, বারান্দায় বা দুর্গাদালানে তাঁর সাথে চান্দ্রেয়ীর দেখা হলে তিনি হাসেন বটে। কোন বাক্য বিনিময় হয় না। দশমীতে বিজয়ার প্রণাম নিয়ে হেমলতা শুধু বলেছেন ভাল থেকো, চান্দ্রেয়ী হেমলতাকে ভয় পায়। (শ্বশুরবাড়ীর ব্যবহারে সে কেঁদেও ফেলে। স্বামী সান্ত্বনা দেয় সব ঠিক হয়ে যাওয়ার, তবে কেউই হেমলতাকে এই নিয়ে কিছু প্র(করে নি কখনো। কন্দর্পনারায়ন ও নয়! এই প্রবল ব্যক্তি(ত্বশীলা মহিলাটা কে বেশ অহঙ্কারী মনে হয় চান্দ্রেয়ীর।

গতকাল রাতে কৃষ(নারায়ন যখন তাকে ভাববেসেছিলো তখনো সে ভাবেনি আজ সকালে এরকম ভয়ানক খবরটা শুনবে। ব্রজকিশোর যে বাড়ি বন্ধক রেখে চান্দ্রেয়ীর বিবাহ দিয়েছিলেন সেই বাড়ি হস্তান্তরের নোট এসে গেছে, আজ তাদের বাড়ি ছাড়তে হবে। টাকা ফেরত দেবার সামর্থ ব্রজকিশোরের নেই। গোঁসাইগঞ্জে এসে ঘরের মধ্যে এক শোকাবহ পরিবেশ দেখে সেও কেঁদে ফেলে। তার ভালোর জন্য আজ সকলে পথে বসছে। ব্রজকিশোরকে দেখে বোঝা যায় তার শরীরটাই যেন শুধু পড়ে আছে। তার ওপর ছুটকি একদিনের নাম করে বেরিয়েছে অথচ তিনদিন হলো কোন খবর দেয়নি, ছুটকির ভাল নাম রাধিকা। চান্দ্রেয়ীর পিসীর ছোটমেয়ে পর পর দু'টো দুর্ঘটনা যখন এই সংসারটার পথ (দ্ধ করে দিয়েছে ঠিক তখন হরিহরের দেওয়ানজীর সাথে রাধিকা ঘরে ঢুকলো, রাধিকার পরনে নতুন শাড়ি। শান্ত সুন্দর চেহারা। কোনো ঝড়ের ছাপ নেই। রাধিকা তার মাকে জড়িয়ে কেঁদে উঠলো। কান্নাপর্ব শান্ত হলে দেওয়ানজী নিজের পরিচয় দিয়ে একটি উইল ব্রজকিশোরের দিকে এগিয়ে দিলেন।

- এই উইল তো এই বাড়ির। এ আপনি কোথায় পেলেন দেওয়ানজী? ব্রজকিশোর বলেন?
- এই উইল এখন আপনাদের কাছেই থাকবে।
- কিন্তু...
- কোনো কিন্তু নয়। এই বাড়ি আপনাদেরই রইলো।
- আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ব্রজকিশোরের গলা বুজে আসে।
- আপনার বাড়ি বন্ধকের টাকা দেওয়া হয়ে গেছে।
- কে দিলো?
- সেটা না জানালে হবে না?

না, না, বলুন।

- হরিহরের রানীমা হেমলতা দত্ত।

শীতের সন্ধে তাড়াতাড়ি নেমে আসে। দিনের মিয়োনো আলোতে একটা হিমজড়ানো কালো কম্পন দিয়ে সাত তাড়াতাড়ি ঢেকে দিয়ে রাত নামে। দু' একটা শাঁখের আওয়াজের সাথে হরিসভার কীর্তন কানে আসছে এখন। হরিপুরের ইন্সপেকটর মল্লিনাথ উঠে দাঁড়ালেন।

- তা হলে চলি।
- ওদের এখুনি জামিন দিও না।
- না, দিন কয়েক থাক হাজতে।
- আসল লোকটাকে পেলে?
- হ্যাঁ, মনে হচ্ছে পরেশনাথ। প্রোমোটার।
- তাকে ধরবে না?
- চেষ্টা করছি। ধরতে না পারলেও শাসিয়ে দেব।
- বাবলু আর বাপ্পাদের হাত থেকে তবে মেয়েরা এখন নিশ্চিন্ত।
- আপাতত তো বটেই।
- এবার অনুমতি দিন। বলল, মল্লিনাথ।
- এসো।

মল্লিনাথ চলে গেলো। ধীরে তার জীপের আওয়াজ মিলিয়ে গেলো। ছেলেটি বেশ, বয়সও কম, হেমলতা ঠিক করেছেন ইন্দ্রানীর সাথে তার বিয়ে দেবেন। আজ বেশ হাল্কা লাগছে। ছেলেগুলো অবশেষে ধরা পড়লো। পাঁচটি মেয়ের তিনি র(া করেছেন ঠিকই কিন্তু পৃথিবীতে বাকি যারা রয়েছে তাদের এইরকম দিনে কে র(া করবেন? ব্রজবাবু সর্বস্ব খুইয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন তিনি জানতেন না। দিন দশেক আগে দেওয়ানজী এই খবরটা জোগাড় করেছেন। আর রাধিকাকে দেখেই তিনি চিনেছিলেন। ছেলের বিয়ের ছবিতে দেখেছিলেন। কথা বলে আরো আ(স্ত হন। হ্যাঁ এযে চান্দ্রেয়ীর পিসীর মেয়ে। চান্দ্রেয়ীদের দারিদ্র্যের রূপ এতটা প্রকট তিনি জানতেন না। দারিদ্র্য, আত্মসম্মানবোধ এসব তো জীবনের প্রচারলগ্নে তিনিও জেনেছিলেন ছেলের বউয়ের অবস্থা তাঁর জানা উচিত ছিলো। এ বোধহয় তাঁরই গলদ। তাঁর চোখে জল এলো। চান্দ্রেয়ীকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে তাঁর।

এই ঘর থেকে বেরিয়ে দশ বারো পা মাত্র। তা তো না যেন অলঙ্ঘ্য দুর্জয় কোনো ম(পারাবার। এই এক বছরে পেরোনো হয় নি। চেষ্টা হয়েছিলো। কি? চান্দ্রেয়ী জানে যে চেষ্টাও করা হয় নি। সেই চেষ্টা করেনি। দশপা পেরিয়ে হেমলতার ঘর। ইস্পেকটর মল্লিনাথ এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন। আজ ছুটকিকে ফিরে পাওয়া সর্বস্বান্ত হতে হতেও বেঁচে ওঠা এতো হেমলতার জন্যই। কেন করলেন এই সব তিনি! চান্দ্রেয়ী এগিয়ে যায়, পা পা করে সেই দশপা লঙ্ঘন করতেই হবে। বুকে একরাশ ভয়। সে কি পারবে! ডাকতে পারবে। একবছরে একবারো যা পারেনি। বা করেনি দেরী হয়েছে বটে তবে আজ তাকে পারতেই হবে। যদি আসে রূঢ় অপমান! আসুক। আর তিন পা। এক পা, মন্দিরে ঘন্টাধ্বনি শু(হলো, চান্দ্রেয়ী এক বছরে প্রথমবার হেমলতার দ্বারে এসে ডাকলো।

- মা। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো।